গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

রাশিয়াকে 'থীম' বা মূলভাগে রেখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হোল আন্তর্জাতিক বইমেলা। ১৯৭৬ সালে শুরু হয়ে এই মেলা আজও এগিয়ে চলেছে – এটা নির্দ্বিধায় বাংলার গর্ব হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যের পাশে পাশে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্ররোচনা মূলক পুস্তকের উপস্থিতি এবং প্রদর্শন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, এটা এবারে বেশ পরিলক্ষিত হল। রাজনীতি এবং ধর্ম চিরকালই সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু তার অঙ্গীকরণের একটি পদ্ধতি আছে। লেখক ও পাঠকগণ সেটা মনে রাখলেই বোধহয় বইমেলার আয়োজন সার্থক হবে।

মাসিক ই-পত্রিকা

কলম হাতে

অনির্বাণ বিশ্বাস, নাহার আলম, সুভাষ মুখার্জী, স্বাগতা পাঠক, ডাঃ অমিত চৌধুরী, কেকা দাস, পিয়ালী চ্যাটার্জী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

বর্ষ ১, সংখ্যা ৯
ফেব্রুয়ারী ২০২০

চালচিত্র সংখ্যা

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

প্রগতির রথ উত্তর-আধুনিক পথ ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলছে। গত কয়েক বছরে আধুনিকতার কাঠামোটির যে বহুল পরিবর্তন হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে মনে পড়ে শিক্ষাধারা ও রুচি বদলের কথা। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে দেখা দিচ্ছে পঠনে অনিহা। কবিগুরুর কথায়, "এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়/ পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়।" সেই পৃথিবীর বিরাট খাতার একটি ভগ্নাংশ হল বই। কিন্তু বর্তমানে বই পড়ার প্রতি আগ্রহের মাত্রায় চূড়ান্ত ভাঁটা লক্ষণীয়। বলা যায়, জ্ঞানসাগরের দিকে দিকে সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম চর, যেই চর পাঠক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অরাজকতার মনভাব সৃষ্টি করছে, সৃষ্টি করছে প্রকৃত জ্ঞানশূন্য কলের পুতুল হয়ে ওঠার মানসিকতা।

আমাদের সকলের অর্থাৎ প্রবীণ প্রজন্মের সাথে নবীন প্রজন্মের ভাবধারার মেলবন্ধন ঘটানো উচিত। যেকোনো বইকেন্দ্রিক আয়োজন হোক সাহিত্যের প্রকৃত পীঠস্থান। যেখানে থাকবে না সাম্প্রদায়িক বিভেদ, স্বার্থসিদ্ধির মুনাফা — থাকবে শুধু প্রত্যেক ভাষার প্রতি আন্তরিক প্রেম, প্রত্যেক ভাষার সরলীকরণ লেখনী, দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষুরধার দৃষ্টিভঙ্গি। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত 'বিবেকানন্দ' করে তুলবে। ■

বিনীতা — রাজশ্রী দত্ত (সম্পাদিকা, গুঞ্জন)

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

আমাদের কথা – পায়ে পায়ে পৃষ্ঠা ০২
রাজশ্রী দত্ত

পরিক্রমা – শিব দুহিতা নর্মদা পৃষ্ঠা ০৬
ডাঃ অমিত চৌধুরী

ভ্রমণ কাহিনী – ডেসার্ট ট্রায়াঙ্গল পৃষ্ঠা ১০
মালা মুখার্জী

ধারাবাহিক গল্প – ছায়া-কায়া পৃষ্ঠা ১৪
রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

কবিতা – আমার অন্তিম অঙ্গীকার পৃষ্ঠা ২২
নাহার আলম (বাংলা দেশ)

নিবন্ধ – বাংলা ভাষাকে বাঁচাও পৃষ্ঠা ২৪
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

কবিতা – অনুসন্ধান পৃষ্ঠা ৩০
অনির্বাণ বিশ্বাস

নিবন্ধ – মোড়কনামা পৃষ্ঠা ৩২
অমিত নাগ (আমেরিকা)

ছড়া – শীতের দিনে পৃষ্ঠা ৩৭
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

বড় গল্প – নিঃশর্ত ভালোবাসা পৃষ্ঠা ৩৮
কেকা দাস

বড় গল্প – শক্তিরূপেন সংস্থিতা পৃষ্ঠা ৪৮
পিয়ালী চ্যাটার্জী

প্রচ্ছদ চিত্রঃ রাজশ্রী দত্ত

কলম হাতে

নিরীক্ষামূলক গল্প – বীণাপাণি পৃষ্ঠা ৫৬
সুভাষ মুখার্জী (নীলকণ্ঠ)

গল্প – খিদে পৃষ্ঠা ৬০
স্বাগতা পাঠক

গুঞ্জনের আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু*

- মার্চ ২০২০ ☞ রহস্য সংখ্যা
- এপ্রিল ২০২০ ☞ নববর্ষ সংখ্যা
- মে ২০২০ ☞ শ্রমিক দিবস সংখ্যা

* বিশেষ কারণে সম্পাদক মণ্ডলী নির্ধারিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করতে পারেন।

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(৮)

হরা গ্রামে রাত্রিবাস। ভোজন দিব্যানন্দজী তৈরি করে ফেলেছেন, ফেন-ভাত। আমাদের নতুন সঙ্গী সাধুটি খেলেন না, শুয়ে পড়লেন। আমরাও মায়ের আরতি করে শুয়ে পড়লাম। রাত কত হবে জানি না। টিম টিম করে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। রাস্তায় কুকুর এবং কিছু নিশাচরের উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম। একটা রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বার বার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেন জানিনা খুব অস্বস্তি হচ্ছে। হঠাৎ সঙ্গী সাধুটির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি বসে আছেন। তাঁর শ্বেতশুভ্র চুল দাড়ি। পরিধান বস্ত্রও সাদা। তাঁর অঙ্গ থেকে বিদ্যুৎএর জ্যোতির মত আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আমি স্থানুর মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কতক্ষন জানিনা, আমার কোন সম্বিৎ ছিল না। যখন এলো দেখলাম সাধুটি আমাকে শুয়ে পড়তে ইশারা করছেন। আমি শুয়ে পড়লাম, কিন্তু কিচ্ছুক্ষন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, এক অব্যক্ত অনুভূতি হল।

কখন জানিনা ঘুমিয়ে পরেছি। ঘুম যখন ভাঙলো ভোর পাঁচটা। এই ঘটনা হয়ত অনেকেই গল্প মনে করবেন, তবে যাঁরা তা মনে করবেন, দায় তাঁদের।

নমামি দেবী নর্মদে

শুধু পরিক্রমার সময় যা ঘটে চলেছে সেইগুলি সাধ্যমত তুলে ধরার দায়িত্ব আমার। আমি সেটাই চেষ্টা করে চলেছি মাত্র। কতটা পারছি তার বিচারক মা নর্মদা স্বয়ং। নর্মদে হর ধ্বনি দিতে দিতে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। সাধুটি আমাদের সাথে এলেন না, উনি আজ এখানে বিশ্রাম নেবেন। জলেহরি পরিক্রমা করছেন, তাই ওনার কোন তাড়া নেই।

আজ রবিবার সূর্যদেব এখনো দর্শন দেননি, অন্ধকার আছে, এগিয়ে চলার ব্রত আমাদের। সকালে পায়ের ব্যাথাটা কম থাকে, তাই যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। পাহাড়ের বুক চীরে রাস্তা, কোথাও চড়াই কোথাও উৎড়াই। প্রায় ১১ টা নাগাদ আমরা চাবি গ্রামে এলাম। বড় গ্রাম, গ্রাম না বলে আধা শহর বলাই ভালো। এক হনুমান মন্দিরে সাময়িক বিরতি নিলাম। এখানে সদাবর্তের ব্যবস্থা আছে। দিব্যানন্দজী ভোজন প্রসাদ তৈরির কাজে লেগে পড়লেন। ঘণ্টা দুই পর আবার চলা শুরু। আমাদের এখনকার অবস্থাটা ঠিক – "এই পথেই জীবন এই পথেই মরণ আমাদের। সব কিছু পথের বুকে।" রাত্রে ঠাণ্ডা থাকলে কি হবে, সূর্য ওঠার সাথে সাথে গরম শুরু হয়ে যায়। ফলে হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। আমরা তিন মূর্তি এগিয়ে চলেছি রাস্তায় যারা আমাদের দেখছে সসম্মানে নর্মদে হর ধ্বনি দিচ্ছে। এরই মধ্যে এক বৃদ্ধা মাতাজী "বাবা রুকিয়ে, বাবা রুকিয়ে" বলে চিৎকার করে চলেছেন। আমি জপ করতে করতে যাচ্ছিলাম তাই বুঝতে পারিনি। কিন্তু দিব্যানন্দজী ওই মহিলার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

নমামি দেবী নর্মদে

দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাতাজী একটা বড় বিস্কুটের প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। দিব্যানন্দজী সময় নষ্ট না করে তাঁর ঝোলায় প্যাকেটটি ঢুকিয়ে নিলেন। মা নর্মদার কাছে মাতাজীর সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সূর্য যত পশ্চিমের দিকে যাচ্ছেন, আমার চলার গতিও তত শ্লথ হচ্ছে। পায়ে ব্যাথাতো আছেই – সঙ্গে পিঠে ভারী ব্যাগের বোঝা। মনে হচ্ছে রাস্তাতেই শুয়ে পড়তে পারলে ভাল হয়। শীতকাল তাই ব্যাগটা বেশ ভারী। হঠাৎ পেছনে এক মহিলার গলা, "বাবা আপ পরিক্রমাবাসী হ্যাঁয়?" ...ক্রমশ ■
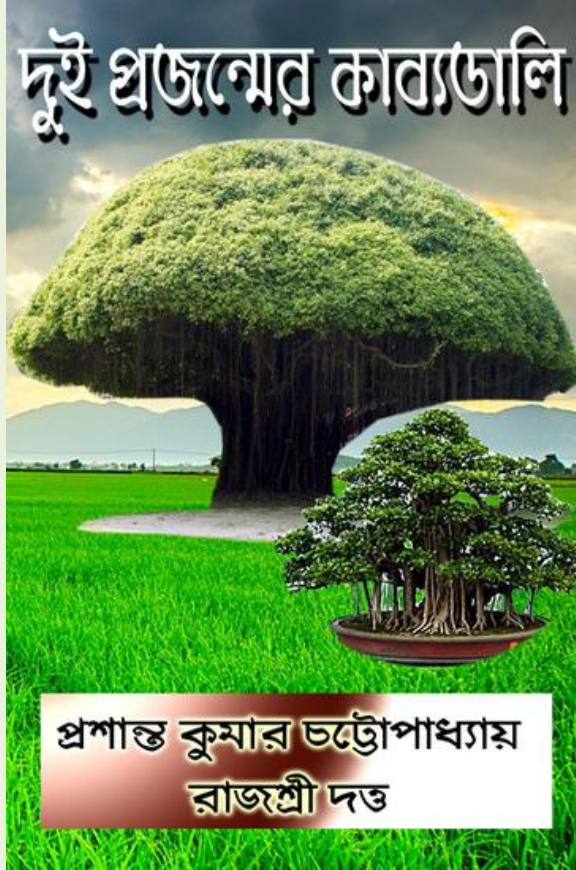
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

মেবার ভ্রমণ

চিতোর পর্ব (২য় ভাগ)

মালা মুখার্জী

কুম্ভশ্যাম মন্দিরের পর মা কালীর মন্দির। ইনি মেবাররাজাদের কুলদেবী। এর পরের পয়েন্ট পদ্মিনী প্যালেস, এখানে জলের ভিতর রাণী পদ্মিনীর মহল। একটি হল ঘরে নিয়ে গিয়ে গাইড জানালো রাণী জলমহলের কিনারায় এলে তাঁর প্রতিবিম্ব জলে পড়ত ও

চিত্র পরিচয়ঃ কুম্ভশ্যাম মন্দির: এখানেই উঠত মীরাবাঈয়ের ভজনের সুর...

সেখান থেকে প্রতিফলিত হত দেওয়ালের কাঁচে। ওভাবেই নাকি আলাউদ্দিন দেখেন রাণীকে। গাইড জানালো এই হলঘরের দেওয়ালে কিছুদিন আগেও আয়না ছিল, সম্প্রতি ফিল্ম নিয়ে গণ্ডগোলে তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। চিতোরের রাণী পদ্মিনী এখানে দেবীতুল্য, তাঁর সম্পর্কে অনেক অসম্ভব কাহিনীও গাইডরা বলতে থাকেন। পরম পতিব্রতা এই মহাসতীর দেহ নাকি কাঁচের মতো স্বচ্ছ, জল খেলে তা গলা দিয়ে নামছে দেখা যেত।

এর পরের পয়েন্ট কীর্তি স্তম্ভ। এটি একজন জৈন সদাগরের করা, কোনো সামরিক অভিযানের চিহ্ন নয়, বরং জৈন তীর্থংকর রিষভনাথের উদ্দেশ্যে নির্মিত এই স্তম্ভ। এর পাশে একটি জৈনমন্দিরও আছে। শুধু মনে রাখবেন প্রতিটা পয়েন্টেই প্রচুর খাড়াই সিঁড়ি।

চিত্র পরিচয়ঃ জৈনমন্দির ও কীর্তি স্তম্ভ...

নেক্সট পয়েন্ট হল দুর্গের তৎকালিন মেইনগেট। পদ্মাবতীর শেষ দৃশ্য নিশ্চয় মনে আছে। আলাউদ্দিন ছুটতে

ছুটতে ওপরে উঠছে আর তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা সেই পয়েন্ট। পাকদণ্ডী বেয়ে নীচে যেতে পারেন, বা ওপর থেকেই দেখতে পারেন সবুজ প্রান্তর যা এককালে সমরাঙ্গন ছিল।

চিত্র পরিচয়ঃ সতী মন্দির ও স্মারক...

এরপর ফেরার পালা, ফেরার পথে রতন সিংয়ের প্রাসাদ বলে কিছু একটা দেখাবে, আর আধুনিক একটি প্রাসাদ, যেখানে এখনকার রাজবংশধরেরা এলে থাকেন। লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড সাতটার আগে শুরু হবে না, তাই টিকিট কেটে এলাম একটা আর. টি. ডি. সি.র মোটেলে। চা ও ভেজপকোড়ার অর্ডার করলাম। আর. টি. ডি. সি.র সব হোটেলেই সিজনাল ভেজিটেবল দিয়ে অপূর্ব ভেজ পকোড়া বানানো হয়। এবারের প্লেটে ছিল আলু, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, পালক ও বেগুন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যে নামছিল, গরম হাওয়ার পরিবর্তে বইতে লাগল ঠাণ্ডা হাওয়া। বয়ে আনা ওভার কোটগুলো জড়াতে হলো গায়ে। ... ক্রমশ ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: মার্চ ২০২০ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০।

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(১১)

ব্রজবাবু হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি পৌঁছে দেখেন, দীনু টেবিলে মাথা রেখে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। ব্রজবাবু কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই একটা কাগজ দীনু ব্রজবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলেন। ব্রজবাবু সবটা পড়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীনুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন – শান্ত হও দীনু। দীনুবাবু মুখ তুলে বললেন,” এটা কি করে হল?”

ব্রজবাবু ধীর কণ্ঠে পাঠ করলেন, “পর্য্যায়ঃ যোগাদ্বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভ্যতে মনুষ্যঃ।” দীনু, যেটা যখন হবার ঠিক তখনই হবে। আগেও না, পরেও না। বিধাতা সব সাজিয়ে রেখেছেন পরপর। তোমার সব উত্তর তুমি কাল পেয়ে যাবে। তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে। ঘরে চলো। এই বলে দুজনে ঘরে চলে গেলেন।

এদিকে বজ্রবাবুর কথা মতো একটু বেশি ডোসের ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয় জয়কে। মাঝরাতে রঞ্জনার ঘুম ভেঙে যায় একটা খচখচ শব্দে। অন্ধকারে সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে! রঞ্জনা

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ধরফর করে উঠে আলোটা জ্বালাতে যাবে, ঠিক সেই সময় একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করে সে। কে যেন প্রবল শক্তি দিয়ে আলো জ্বালাতে বাধা দিচ্ছে। রঞ্জনা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। তারপর সজোরে তাকে দূরে ঠেলে, নিমিষে ঘর থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে চলে যায়।

যখন রঞ্জনার জ্ঞান ফেরে, সে চোখ খুলে দেখে সামনে তার মামা দাঁড়িয়ে আছেন। একটু সামলে উঠে, রাতের সব ঘটনা সুধীরবাবুকে সে জানায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কাল রাতে রঞ্জনার ঘরের কিছুই খোয়া যাইনি। তাই সুধীরবাবুও রঞ্জনার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। রঞ্জনা কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছে বলে তিনি ধারণা করেন সুধীরবাবু।

সকাল গড়িয়ে বিকাল হয়ে এল, পশ্চিম আকাশে ফিকে অরুণের ম্লান রেখায় আর ক্লান্ত পাখিদের ডানায় ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। কালকের ঘটনাটাকে নিয়ে মনের মধ্যে ভীতি আর দ্বন্দ্বের দোলাচল চলতে থাকে রঞ্জনার। তবু মহেশের ফোন আসার পর রঞ্জনা তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়ল। বাস থেকে নেমে এলগিন রোডে, মহেশের নতুন ফ্লাটের ঠিকানাটা ব্যাগ থেকে বার করতে গিয়ে সে দেখে ব্যাগে ঠিকানার কাগজটা নেই। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে আছে কাল সেটা সে ব্যাগে রেখেই শুতে গিয়েছিল। সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল রঞ্জনার। অবশেষে মহেশকে ফোন করে সে

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ঠিকানাটা জেনে নিয়ে তার ফ্লাটে উপস্থিত হল রঞ্জনা। মনে মনে জানত মহেশ কোনদিনও ভালো মানসিকতার লোক নয়। বহু নিকৃষ্ট ব্যাপারের সাথে সে নানাভাবে জড়িত। রঞ্জনার মতো স্বভিমানী মেয়ে কোনদিনই মহেশের মতো চরিত্রের মানুষের কাছে ধরা দেয় না। কিন্তু তবুও তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহেশের ডাকে সাড়া দিয়ে তার পারসোনাল ফ্লাটে রাতের আঁধারে আসতে হয়েছে।

ছলনার এক মৃদু হাসি মুখে ফুটিয়ে রঞ্জনা বলল, "ওফফ, তোমার বাড়ি খুঁজতে হয়রান হয়ে গিয়েছি। আর বোলো না, তোমার সাথে দেখা করার আনন্দে তোমার ঠিকানাটাই সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি। তাই তো তোমাকে ফোন করলাম। আমি অনেক ভেবে দেখলাম মহেশ আমার জয়কে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। হ্যাঁ জয় ভালো খেলত, ভালো নাম ডাক ছিল। কিন্তু সেটা তো তোমার মতো কোচকে পেয়েছে বলেই সম্ভব হয়েছে ওর পক্ষে। অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে জয় আমাকে খুব তাচ্ছিল্য করতে থাকে। ভালবাসা দূরে থাক, ওর মধ্যে সামান্য মানবিকতাবোধটুকুও নেই আর। শুধু কি আমার সাথে! তোমার সাথেও তো বেশ একবছর ধরে বিরোধ চলছে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তোমারই দোষ, কিন্তু এখন দেখছি ওটা জয়েরই অকৃতজ্ঞ মানসিকতা।" মহেশ রঙিন জলপূর্ণ মিশরীয় কাঁচের একটা গ্লাস রঞ্জনার

দিকে বাড়িয়ে দিল, তারপর রঞ্জনার পাশে এসে বসল। রঞ্জনা ঘৃণা, ভয়কে মনের পর্দায় লুকিয়ে রেখে আবার মুচকি হাসল।

মহেশ খ্যারখ্যারে গলায় বলে – রঞ্জনা তুমি জানো না, জয় আমাকে কতটা অপমান করেছে। জানো আমার জায়গাটা ও পেত। আমার এই পজিশনে আসতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আর জয় একটা দুদিনের খেলোয়াড় কিনা পাবে আমার পজিশন! এটা কি মেনে নেওয়া যায়? যা মহেশ পায় না তা অন্য কারোর পাওয়ার ক্ষমতা নেই রঞ্জনা। রঞ্জনা বলল, “হ্যাঁ ঠিক বলেছ। তা তোমার প্রিয় এই ব্রাউন ব্লেজারের মাঝের দুটো বোতাম কি হল?”

– ছিঁড়ে গিয়েছে। বাড়িতেই কোথাও আছে বোধ হয়!

– দাও আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, ভালো লাগছে না দেখতে।

মহেশ একটু ইতস্তত হয়ে বলে, “ও পরে দেখা যাবে, এখন...। এই বলে মহেশ ক্রমশ রঞ্জনার আরও কাছে আসতে থাকে। রঞ্জনা এবার একটু ভয়ে সিটিয়ে যায়। কারণ রঞ্জনার উদ্দেশ্য ছিল জয়ের পঙ্গু হওয়ার প্রকৃত ঘটনাটা অনুসন্ধান করা। কিন্তু এ তো হিতের বিপরীত। রঞ্জনা মনে মনে বাঁচার উপায় ভেবে কিছু বলতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কে যেন বারবার টোকা দিতে লাগল। মহেশ বিরক্ত হয়ে দরজাটা খুলল। কিন্তু খুলেই যা সে দেখল,

তাতে তার চোখ কপালে উঠে যায়। চারিদিকে শুধু ঘন কুয়াশার মতো ধোঁয়া। এতো কুয়াশা যে সামনের ফ্ল্যাটের দরজাটাও দেখা যাচ্ছে না। সেই ধোঁয়া থেকে হালকা একটা অবয়ব যেন এগিয়ে আসছে মহেশের দিকে। ক্রমশ অবয়বটি পরিস্কার হয়ে মহেশের চোখে ধরা পড়ে। মহেশ আতঙ্কে আশ্চর্যান্বিত হয়ে আঁতকে ওঠে, মহেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জয়। চোখে যেন তার এক গভীর প্রতিহিংসার ছাপ। মহেশ কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, "জয়.... জয় তুমি হাঁটতে পার! এটা কি করে সম্ভব! ডঃ মিত্র যে বলেছিল তুমি যে আর কখনও হাঁটতে পারবে না। কাঁপা কাঁপা গলায় মহেশ রঞ্জনাআআ রঞ্জনাআআআআ......" বলে চিৎকার করে ডাকতে থাকে। রঞ্জনা ছুটে এসে দেখে জয় নিজের পায়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এ ব্যাপারটা রঞ্জনা বহুবার দেখেছে, কিন্তু জয় তা স্বীকার করে নি। রঞ্জনা বা মহেশ কিছু বলার আগেই এক বিকট ক্রুর স্বরে জয় হাসতে লাগল। একটা দমকা হাওয়া ঘরের সব জিনিসকে ওলটপালট করে দিল। নিমিষের মধ্যে ঘরের আলো নিভে যায়। আর তারপরেই এক বিকট কানফাটা আর্তনাদ...

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। টেবিল ল্যাম্পটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে,মাঝে মাঝে জ্বলছে, মাঝে মাঝে নিভছে। মৃদু আলোটা সামনের কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে রঞ্জনার মুখে এসে পড়েছে।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

সেই কাঁচেই ভেসে উঠছে একটি আবছা অবয়ব। অর্ধ-অচেতনে শায়িতা রঞ্জনার চোখের সামনে দিয়ে একটা পোড়ো হাত মহেশকে হ্যাচরাতে হ্যাচরাতে সোজা বাইরের দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর মহেশ প্রাণপণে বাঁচার জন্য আর্তি করছে। কিন্তু দরজাটার সামনে স্নিগ্ধ আলোর ছটা, যা সব অন্ধকার দূর করে দিল। আর সেই পোড়ো অবয়বটা ধুলোর মতো হাওয়ায় মিশে গেল। চারিদিক একেবারে শান্ত। তিনটি প্রদীপ নিয়ে তিনজন অর্থাৎ ব্রজবাবু, সুধীরবাবু আর দীনুবাবু ঘরে ঢুকলেন।। দরজার সামনে জয় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে আছে। মহেশবাবু ভয়ে-আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। আর অনতি দূরে রঞ্জনা প্রায় অধঃচেতন।

খানিক বাদে রঞ্জনার জ্ঞান ফিরল। এখনও মহেশ ভয়ে কাঁপছে আর মনে মনে বিড়বিড় করছে, "আমাকে ছেড়ে দাও জয়। আমি সব স্বীকার করছি, তোমার অ্যাকসিডেন্টের জন্য আমি দায়ী। আমি চাইনি তুমি আরও উচ্চপদ পাও। আমাকে ছেড়ে দাও......" পুলিশ মহেশ রায়কে থানায় নিয়ে গেল।ব্রজবাবু, সুধীরবাবু ও দীনুবাবুর সাথে রঞ্জনা অচেতন জয়কে নিয়ে জয়ের বাড়ি ফিরলেন। ■

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণকে 'পাণ্ডুলিপি'র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলা ভাষা দীর্ঘজীবী হোক...

নাহার আলম □ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.) □ অনির্বাণ বিশ্বাস □ অমিত নাগ □ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.) □ কেকা দাস □ পিয়ালী চ্যাটার্জী □ সুভাষ মুখার্জী □ স্বাগতা পাঠক

আমার অন্তিম অঙ্গীকার

নাহার আলম (বাংলা দেশ)

ও পৃথিবী, তুমি এবার ধ্বংস হও!
মানবতার মুক্তি দাও! একটু কৃপা করো এবার!
দোহাই তোমার...

এখানে এখন মানুষ দেখি না কোথাও!
এখানে এখন শুধু রক্তনদীর প্লাবন দেখা যায়!
এখানে এখন মায়াহীন দুপেয়ে জানোয়ারে সয়লাব!
এখানে এখন খুনোখুনি খেলা চলে হরদম!
এখানে এখন ধ্বজভঙ্গের শতকোটি দঙ্গল!
এখানে এখন মদের বদলে রক্ত গিলে খায়!
এখানে এখন হাঁড়ি নয় নারী চেটে বেড়ায়!
এখানে অস্ত্রের কারবারিরা ফুলে ফেঁপে যায়!
এখানে সদ্যজাত শিশুরা পোয়াতির ব্যথা পায়!
এখানে আদালতপাড়া অবকাশকেন্দ্র বানায়!
এখানে শতকোটি পরশুরাম নেচে কুঁদে বেড়ায়!
এখানে পাখিদের কথা শোনে না কেউ!
এখানে দক্ষযজ্ঞে বাড়ে বিবর্তনী ঢেউ!
এখানে মানুষ হয়ে আর জন্মায়নি কেউ!

তাই পৃথিবী, তোমার কাছে ন্যায্য আর্জি আমার,

অপভ্রংশ

তোমার মৃত্যু চাই, মানুষ নামের মানুষকে আবার জন্মাতে দাও...
দোহাই তোমার!

আমি সেইদিন পুষ্প মাল্য গলায় জড়িয়ে
আত্মহত্যা করে নতুন জন্ম নেবো আবার,
কথা দিলাম, শপথ নিলাম...
ফিরে এসে সব দিবস পালন বন্ধ করে
একটিমাত্র ‘বর্বরতা-মুক্তি-দিবস’ ঘোষণা করে যাবো...
এটাই আমার অন্তিম অঙ্গীকার... ■

আহ্বান

বাংলা ভাষাকে বাঁচাও

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

বাংলা ভাষার দুই মহান দিকপাল শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সুকুমার সেন মহাশয়ের বক্তব্য অনুযায়ী আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে এই ভাষার উৎপত্তি। আবার বাঙালি সুপণ্ডিত জনাব মুহম্মদ শহীদুল্লাহের গবেষণা থেকে জানা যায় যে ভাষাটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই জন্ম লাভ করে। উৎপত্তির সময় নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিগত পাঁচশো বছর ধরে যে এই ভাষা বৃহত্তর ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য কিছু দেশেও চলে আসছে, সে তথ্য সর্বজনজ্ঞাত।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, #এথনোলগের ২০০৫ সালের গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, পুরো বিশ্বে ব্যবহৃত ৩০ টি প্রধান ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা রয়েছে সপ্তম স্থানে, এবং সর্বসাকুল্যে দুনিয়ার ২৩০ মিলিয়ন ব্যক্তি এই ভাষাটি ব্যবহার করেন – যার মধ্যে ১৯৬ মিলিয়ন মানুষের এইটিই হল মাতৃভাষা।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা এবং ভারতের সংবিধান স্বীকৃত একটি ভাষা হওয়া ছাড়াও,

আহ্বান

বাংলা সুদূর পশ্চিম আফ্রিকার অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী একটি দেশ সিয়েরা লিওনএর অন্যতম সরকারি ভাষা।

#Top 30 Languages by Number of Native Speakers

Data source: Ethnologue: Languages of the World, 15th ed. (2005)

Serial No.	Language	Approximate No. of Speakers	Where is it spoken as the official language?
7.	Bengali	NATIVE: 196 million TOTAL: 215 million	OFFICIAL: Bangladesh, India (Tripura, West Bengal)

* Abridged to save space...
Source of the complete statement: https://www.vistawide.com/languages/top_30_languages.htm

২০১০ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা হিসাবে পরিগণিত করেছে। বাংলা ভাষা এত মিষ্টি কেন? এর উত্তর হিসাবে বলা যেতে পারেঃ ১) বাংলা ভাষা খুব সহজেই বলতে এবং আয়ত্ত করতে পারা যায় তার কারণ এর ব্যাকরণ অতি সহজ। সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন অন্যান্য অনেক ভাষার মত এই ভাষাটিতে 'লিঙ্গ' বা 'কাল' নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়নি, যার ফলে ব্যবহারের সময় অত সজাগতার প্রয়োজন হয়না। ২) এই ভাষার শব্দগুলির মধ্যে বন্ধুরতা

বা রূঢ়তা তেমন নেই বললেই চলে। এর স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলি অতি সহজেই সবার দ্বারা উচ্চারণ করা সম্ভব হয়। ৩) বাংলার শব্দভাণ্ডার অতিশয় সমৃদ্ধ, তাই ভাব প্রকাশের জন্য লেখক বা বক্তাকে বেশি বেগ পেতে হয়না। ৪) শেষ কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার এই ভাষা প্রসঙ্গে বলতে হয় যা হল এই ভাষার উচ্চারণ রীতি। ব্যঞ্জনে 'অ' যুক্ত হওয়ায় প্রতিটি শব্দই একপ্রকার কাব্য-মাধুর্যের সৃষ্টি করে।

সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাথে বাংলার এই বৈষম্যকে লক্ষ্য করেই বোধ করি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) লিখেছিলেন, "বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়, উক্ত ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা – এক কথায় একটি নবশাখা ভাষা।"

২০১১ সালের জনগণনার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে হিন্দীর পরেই ভারতের জনগণ যে ভাষাটিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন তার নাম 'বাংলা'*।

STATEMENT*

Scheduled Languages in Descending Order of Speakers' Strength – 2011

S. No.	Language	Persons who returned the language as their mother tongue	Percentage to total population
1	Hindi	52,83,47,193	43.63
*2	Bengali	9,72,37,669	8.03

আহ্বান

* Abridged to save space...
Source of the complete statement:
http://censusindia.gov.in/2011Census/C-16_25062018_NEW.pdf

আমরা জন্মসূত্রে এই সুন্দর ভাষাটির উত্তরসূরি, কিন্তু এই মুহূর্তে একটি প্রশ্ন আমাদের অনেক চিন্তাবিদদের কাছেই দণ্ডায়মান তা হল এই ভাষার ভবিষ্যৎ কি? যদিও ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী যে ভাষা ১০,০০০ জনেরও কম ব্যক্তি ব্যবহার করেন, সে ভাষার বিলুপ্তির সম্ভাবনা প্রবল – তাই বাংলা ভাষা এখনও সেই রকম কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি, তবুও রবীন্দ্রোত্তর যুগে এই ভাষার দ্রুত অবক্ষয় নিঃসন্দেহে একটি বৃহৎ চিন্তার কারণ বৈকি।

এই অবনমন শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই, যা আজ অতিশয় ত্বরিত। শ্রী প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায়, "আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান চেষ্টা হয়েছে আমাদের মন ও ভাষার মধ্যে থেকে তার দেশী খাদটুকু বাদ দিয়ে তার আর্য সোনাটুকু বার করে নেওয়া। প্রথমত ওরূপ খাদ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, দ্বিতীয়ত সম্ভব হলেও বড়ো বেশি যে সোনা মিলবে তাও নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দেশী অংশটুকু বাদ দেবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন। ওতো খাদ নয়, ঐ তো হচ্ছে বাঙালি জাতির মূলধাতু। এবং সে ধাতু যে অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষা করবার জিনিস নয়, তা যিনিই বাঙালির প্রাচীন ইতিহাসের সাধন রাখেন তিনিই মানেন।"

আহ্বান

পালটেছে যুগ, বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় যেমন ইংরাজীর প্রভাব অতি স্পষ্ট, ঠিক তেমনই আজকের বাংলা ভাষায় হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় বা পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ এবং ভাবভঙ্গীর আপনায়নের চেষ্টা সুস্পষ্ট। নব্য প্রজন্মের মধ্যে এই প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত, যার ফলে বহুলাংশে বাংলা ভাষার মৌলিকত্ব অত্যন্ত দ্রুত এবং কদর্যভাবে আক্রান্ত হচ্ছে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা নতুন কোন তত্ত্বের ক্ষেত্রে হয়ত সব শব্দের প্রতিশব্দ তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়না, তাই কিছু ভিনদেশি শব্দ সাময়িক ভাবে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য, কিন্তু তাই বলে সরল সুবোধ বাংলা ভাষার শব্দগুলিকে অহেতুকভাবে বিসর্জন দিয়ে সেই স্থান অন্যভাষার শব্দ দিয়ে পূরণ করার যে উদ্দম প্রয়াস আজ চলছে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না।

এই প্রসঙ্গে সরকারি উদ্যোগের চেয়েও বেশি প্রয়োজন স্বদেশী ও বিদেশী প্রতিটি বাঙলাভাষী পরিবারের আন্তরিক এবং সজাগ প্রয়াস। প্রতিটি শিশুকে শেখান উচিত – যখন বাংলা বলবে বা লিখবে প্রতিটি শব্দ যেন বাংলার হয়। যদি ভাব প্রকাশে অসুবিধা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই শব্দটির বাংলা সমস্থানিক শব্দটি আয়ত্ত করার প্রয়াস নাও। আর উচ্চারণে বাংলার মাধুর্য বজায় রাখার চেষ্টা কর। ভিনদেশি ভাষার নকলে বাংলা ব্যাঞ্জন বর্ণকে টুকরো করে উচ্চারণ কর না। বাঙ্গালির ভাবে বাঙ্গালির ঢঙ্গে বাংলা বলো এবং লেখো। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এই হোক আমাদের আন্তরিক সংকল্প। ■

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আমাদের ভাবনা

"ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বাংলা বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক।"

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"স্বাধিকার সংগ্রাম থেকেই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। আজ যদি সেই জাতীয়তা-বাদী চেতনা বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমি সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করি তা আমাদের চরম দীনতা ও নৈতিক পরাজয়। আমাদের বিশ্বায়নের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন বাংলায়ন।"

জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ

"আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা, আমরা কি আমাদের অবমাননা করিয়াছি? কোন দেশে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া তদ্দেশীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া দেশীয় ভাষা ব্যবহার করা অবমাননার বিষয় নহে; পরন্তু বীর্য্যবান দেশাদি মাতৃভূমি ভাণ করিয়া তাহাদের বিকৃতিপ্রাপ্ত ভাষা ব্যবহার করা উপহাস-সঞ্চারক। ইহাও অল্প রহস্যের বিষয় নহে, প্রকৃত মাতৃভূমির প্রতি ঘৃণা করিয়া পশ্চিমদিক্বাসী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে গৌরব বিবেচনা করি।...যাহা হউক, আমরা বাঙ্গালী বলাতে আমাদের অবমাননা হয় নাই...।"

জনাব মীর মশাররফ হোসেন

অনুসন্ধান

অনির্বাণ বিশ্বাস

ইঁট-কাঠ-দেওয়ালেতে খুঁজে ফিরি
শরীরের স্পন্দন,
বহুতলের বহুমুখের ভীড়ে
হারিয়ে যাওয়া এ কোন আমি?
স্ট্যাটাসের প্রলেপে ভেজানো সাজানো কথা বলা
মেকী মানুষের মাঝে, ঐ তো আমিও...
লিমিটেড খাওয়া, লিমিটেড হাসি, লিমিটেড বাচনভঙ্গিতে,
পালিশ হওয়া সভ্য সমাজের মাঝে
ঐ তো, ঐ তো আমিও আছি...

যাক বাব্বা নিশিন্ত আমিও
শিখে ফেলেছি লিমিটেড সমাজের আদব-কায়দা।
কি হবে প্রাণ খুলে হেসে কিংবা
নিজের ইচ্ছে মতো খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিয়ে?
হাজার মনের ভীড়ে না থেকে, নিজের মতো
বাঁচো – শুধুই নিজের আখের গোছাও।
মানুষকে নিংড়ে নিয়ে হাই রাইজে বসে,
সুন্দরী গৃহিণীর সাথে – ঐ ঐ তো আমি
সোমরসে মত্ত।

খোঁজ

ছেলেবেলার সেই অকাতরে ঘুম-
মায়ের ডাকে চোখ মুছে ওঠা সেই ছেলেটা,
যে অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত
সে বহুদিন ধরে নিরুদ্দেশ।
অনুসন্ধান চলছে...

কেউ কি দেখেছেন?
ইস্ চুপ চুপ সন্ধ্যে সাতটা পঁয়তাল্লিশ...
"নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা..."
"কি!! কি পাওয়া গেছে? পাওয়া গেলো তাহলে?
অবাক ব্যপার!"
"একটু অ্যাড্রেসটা দেবেন! প্লিজ ..." ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com
২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।
৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।
৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

মোড়কনামা

অমিত নাগ (আমেরিকা)

শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে বলে মনে হতো। এখন এই পরবাসে শীত বলতে যা বুঝি তার কাছে হয়তো কিছুই নয়। তবুও সেই হিটারহীন, এসিহীন, কল খুললেই গরমজল, ঠান্ডাজল উপচে পড়ার সুবিধারোহিত ঘরে শীত গ্রীষ্ম দুটোই চরম এবং বেশ অসহনীয় বলেই মনে হতো। শীতকাল মানে যেমন বার্ষিক ফাইনাল পরীক্ষা, চিড়িয়াখানা যাওয়া, পিকনিক, ইডেন গার্ডেনসে টেস্ট ম্যাচ, নলেন গুড়, ফুলকপি, নতুন আলু বোঝাতো, তেমনি বোঝাতো বড়দিন আর বড়দিনের ফ্রূট কেক। কাজু কিসমিস আর নকল চেরি ভরা সেই অল্প ময়েস্ট পাউন্ড কেক আনতে বাবার কোনো দিন ভুল হয়নি। বড়দিনের সকালে ঘুম থেকে উঠে, টেবিলের ওপর বাদামী-হলুদ অর্ধস্বচ্ছ সেলোফেন জাতীয় কাগজে মোড়া সেই মহার্ঘ্য কেক অনিবার্যভাবে দেখা গেছে বছরের পর বছর। আগের রাতে অফিস ফেরত নিউ মার্কেট থেকে বাবার কিনে আনা ফ্রূট কেক। ভুল হবার অবকাশ নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের অনেকদিনের অভ্যেস, কিছু কিছু জিনিস ভোলার নয়, অরন্ধনে গোটা সেদ্ধ, দোলে মঠ, রথের দিনে পাঁপড়-জিলিপি, নবমীতে মাংস যেমন, তেমন শীতকাল এলেই,

বিট, গাজর, কড়াইশুঁটির ঘি গোলমরিচে জারিত স্টু, আর এই বড়োদিনের পাউন্ড কেক।

আরো কিছু কিছু শীতকেন্দ্রিক বাসনাকে বাড়ির লোকেরা প্রশ্রয় দিতে তেমন আপত্তি করতো না। যেমন মাঝে মধ্যে ঘন দুধ দিয়ে তৈরী নেসক্যাফের অনুরোধ, টোস্টের ওপর মাখনের প্রলেপ একটু মোটা করার অনুরোধে কেন জানি শীতকালে রাজী করিয়ে নেওয়া যেত স্বল্পায়াসেই। আর কেনা জানে শীতের সকালে চাদর জড়িয়ে মাখন টোস্টে কামড় দিয়ে ঘন দুধের মিষ্টি মিষ্টি কফিতে চুমুক দেবার আয়েশের সেই কথা।

হালকা বাদামী-হলুদ সেলোফেন পেপারের মোড়কটা ছিল পাউন্ড কেকের সিগনেচার প্যাকেজিং। আরও যে একটা জিনিসের মোড়ক হিসাবে ওই কাগজ ব্যবহৃত হতো তা হলো গরম কালের আমসত্ত্ব। চোখের সামনে কাগজটা গগলস হিসেবে মেলে ধরে দুনিয়াটাকে হলদে রঙিন চোখে দেখে মজা পেতাম। সে ছিল ছেলেবেলার কথা। আর পরে সদ্যপ্রাপ্ত বড়বেলায় ওই কাগজে মোড়া যে নিষিদ্ধ বস্তুটা দেখেছি তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সমীচীন হবে না। এক এক জিনিসের যে এক এক রকম মোড়ক হতো এবং জিনিসটির দাম অনুযায়ী মোড়কের যে বিশেষ তারতম্য হতো তা আমাদের নজর এড়াতো না। পাউন্ড কেক যদি হলুদ সেলফোন কাগজে মোড়া হতো তো দামি দোকানের স্বতন্ত্র একক কেকের ছিল নিজস্ব

বাক্স। নাহুম বা ক্যাথলিন এর সেই সব কেকেরা আরো একটু রহিস লোকেদের রসনা মেটাতো। যে কৌটোতে ওই একক কেক বেক করা হয়েছে, সেই পাত্রটি থেকে যাতে সহজেই কেক খুলে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য তলায় ও ধারে থাকতো বিশেষ ওয়াক্স পেপার। কেক কাটার আগে আলতো করে মসৃন ভাবে সেই ওয়াক্স পেপার খুলে ফেলার উত্তেজনাও কিছু কম নয়। নিত্য প্রয়োজনীয় মশলাপাতির জন্য যদি কাগজের ঠোঙা, মশলা-মুড়ি বাদামের জন্য খবরের কাগজের চোঙা, ফুচকা কচুরির জন্য শালপাতার ডোঙা হয়, তবে আঙ্গুর আর বেদানার জন্য ছিল রাজকীয় মোড়কের ব্যবস্থা।

বাঙালিরা কেন জানি না আঙ্গুর আর বেদানাকে বিশেষ খাতির করতো! এক বিশেষ ধরণের হালকা ফিনফিনে গোলাপি রঙের টিস্যু পেপারে ওই ফলগুলি সাজিয়ে রাখা হতো। ওই একই ধরণের গোলাপি কাগজে ছোট খাটো সোনার গয়নাও মুড়ে দিতো স্যাঁকরারা। বোধহয় আঙ্গুর বেদানা সোনার সমতুল্য মনে করা হতো। কারণ বাঙালির ধারণা ছিল একটা আঙ্গুর বা বেদানার এক একটা দানা মানে শরীরে সাক্ষাৎ এক এক ফোঁটা রক্তের জন্ম। তাই মরণাপন্ন রোগীদের দেখতে যাওয়ায় সময় হাসপাতালে আঙ্গুর বা বেদানা নিয়ে দেখা করতে যাবার প্রচলন ছিল। কখনো কখনো হকারদের ছোট ছোট বিশেষ মহামূল্যবান আঙ্গুরদের যত্ন করে তুলোর বিছানায় শুইয়ে রাখতেও দেখেছি। যেখানে

সেকাল-একাল

আম, জাম, লিচুর মতো ফলেদের ঝুড়ির ওপর ঢালা পাতার বিছানায় শুইয়ে রাখা হতো। আঙ্গুরদের জন্য আরও ছিল এক সুক্ষ সোনালী বা রুপোলি রঙের বিশেষ ছোট্ট কাঁচি যা দিয়ে যত্ন করে কেটে অল্প এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিক্তির মতো ছোট মাপের দাঁড়িপাল্লায় তোলা হতো। এক সঙ্গে আধ কেজি, এক কেজি আঙ্গুর কেনার কথা ভাবাই যেতনা।

বিদেশের সুপারমার্কেটে প্রথম দেখলাম, ফলগুলো এক একটা পলিইউরিথিন এর নিজস্ব জালে মোড়া। তা দেখে দেশ থেকে আসা এক আত্মীয়া মজা পেয়ে বললো, ওমা ফলগুলোকে কেমন জামা পরিয়ে রেখেছে দেখো! সেবার ছুটিতে দেশে গিয়ে দেখি ওখানেও মল আর সুপারমার্কেটের ফ্যান্সি কোণায়, ফলগুলোকে স্বত্রন্ত্র জামা পরিয়ে রাখা হয়েছে। ঝুড়িতে পেতে রাখা পাতার স্তূপের ওপর চূড়ো করে আর ফল রাখা হয় না, এ সব দামি বাজারে। ধোপ দুরস্ত পোশাকের দুরন্ত আধুনিক যুবক যুবতীরা সেই সব ফল কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

সময় পাল্টে গেছে। যৌথ সংসার ভেঙে ছোট হতে হতে, এখন আমরা একার সংসারে থাকি। নারী পুরুষ দু পক্ষই প্রবল ব্যাক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। সম্পর্ক গড়ার জন্য দু পক্ষকেই যে একটু আপস করতে হয়, তা জানা থাকলেও, নিজেদের ভূমি থেকে সুচাগ্র মেদিনী ছেড়ে দিতে আমরা আর রাজি নই। তা ছাড়া কেরিয়ার গড়তে ব্যস্ত আমাদের

সেকাল-একাল

সম্পর্ক গড়া নিয়ে আদিখ্যেতা করার সময়ও নেই বিশেষ। তাই সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে নিজের একান্ত সংসারে ফিরে, যৌবনের প্রারম্ভেই নিজের রোজগারের টাকায় কেনা এপার্টমেন্টের নিরিবিলি ব্যালকনিতে, হেলানচেয়ারে গা এলিয়ে বসে, নিজের সাফল্যের অন্যতম ফসল একক ফলটির বিশেষ জামা ছাড়িয়ে একাকী খাই। হাই রাইজ এপার্টমেন্টের অনেক অনেকতলা নীচে দোকানগুলোর আর রাস্তার ধারের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিঙের নিওন আলোরা ঝকমক করে জ্বলে। এতো উঁচুতে বলে গাড়ির বা মানুষের আওয়াজ এসে আমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে পারে না। আলো কমানো ঘরের ভেতর থেকে হালকা সংগীতের মূর্ছনা ভেসে আসে ব্যালকনিতে। শান্তি বিঘ্নিত করে ফলের ভাগ চেয়ে বলার কেউ থাকে না – 'দাও তো একটুকরো, চেখে দেখি কেমন স্বাদ তোমার ফলের'। আজকাল শীত আর তেমন পড়ে না এ তল্লাটে। তবুও আমাদের এই ওপর তলায় হাওয়া একটু বেশি জোরে বয় বলেই বুঝি শীতের শিরশিরানি ভাবটা নিচের তলাগুলো থেকে একটু বেশী। এখনো শিরশিরানি ঠান্ডায় আগের মতোই গাঢ় দুধ-চিনি দিয়ে গরম কফি খেতে ইচ্ছে হয়। তবে সে কফি নিজেকেই বানিয়ে নিতে হয়। জড়ানো চাদরের ওম গায়ে মেখে আবদার করে, কই এক কাপ বেশ কড়া করে গরম কফি দাও তো দেখি, বলার মতো তেমন কেউ আর নেই সঙ্গে। ■

শীতের দিনে

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

(১)

পটভূমি

শীতের দিনে ঝরে বারিশ
টুপ টুপ টুপ...
রাত ন'টাতেই সব খোকারা
চুপ চুপ চুপ...

(২)

আহ্বান

বাবলা গাছে বাঘ বসেছে
দেখতে কে চাস, চল...
কম্বলটা কেঁপে বলে – ভাই,
দেখে এসে ঘটনাটা বল...

(৩)

অবস্থা

দাঁতগুলো সব ঠকঠকিয়ে
জুড়েছে জলসা...
মাথার ওপর শিশির ঝরে,
শীত পড়েছে খাসা।

(৪)

ঘরে বাইরে

বিছানাটা আইস-বেড
ঘরের ভিতর ঘন কুয়াশা...
বাইরেত কথা নেই,
গোধুলি গগনে ঘন তমসা...

(৫)

আশ্রয়

খাট থেকেত যায়না নামা
মেঝেয় মারে ছেঁকা...
পাশ ফিরতে ভয় লাগে ভাই,
কম্বলটাও দিতে পারে ধোঁকা...

(৬)

সংশয়

খুলবে কি চোখ কাল সকালে
কে জানে রে ভাই...
'হোয়াটস-অ্যাপে'ই তাই সবারে
'বাই'টা বলে যাই... ■

নিঃশর্ত ভালোবাসা

কেকা দাস

ছয় নম্বর কেমো নিতে নিতে যন্ত্রনায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে টের পেল সুমনা, এক বলিষ্ঠ হাত তার মাথার চুলে হাল্কা হাতে ম্যাসেজ করছে। প্রতিটি কেমোর সময়ই এই হাত তার হাতদুটি ধরে বা মাথায় আঁকিবুকি কাটে কিন্তু লজ্জায়, অপমানে সুমনা চোখ মেলে তার দিকে তাকাতে পারেনা – আর সেইজন্যেই সেই হাতের অধিকারী বেশিক্ষণ থাকেন না।

আজ তার ব্যাতিক্রম হলো. সেই হাতের মালিক কথা বলে উঠল – "'সু' এমন করে আর নিজেকে দগ্ধ কোরনা, অনেক শাস্তি দিয়েছ নিজেকে আর নয়। এবার অন্ততঃ আমার কথা ভেবে, এসো আমরা দুজনে যে কদিন বাঁচি, বাঁচার মত করেই বাঁচি।"

সুমনার কানের মধ্যে দিয়ে কথাগুলো মধুর মত প্রবেশ করলেও, সে লজ্জাতে তাকাতে পারছিল না। তার অসামান্য রূপ, যা নিয়ে তার গর্বের শেষ ছিল না... সব শেষ। মাথা ভর্তি অত যত্নে রাখা চুল সব উধাও। এই কুৎসিত রূপ সে আর সহ্য করতে পারছে না। কুন্তল তার ছোটবেলাকার বন্ধু... যে পরে জীবনসাথী হয়, সে আজ একটা উইগ কিনে এনেছে।

বন্ধন

কুন্তল বলল, "'সু', এটা পড়ে দেখো তোমার অন্য ব্যাক্তিত্ব ধরা পড়বে।"

সুমনা এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে কুন্তলের হাত ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, "ক্ষমা করতে পারবে আমায়! ভালোবাসতে পারবে আবার সে কথা বলার ক্ষমতা নেই আর, তাই শুধু ক্ষমা করো..."

আসলে সুমনা আর কুন্তল দুজনেই সহপাঠী ছিল, সঙ্গে আবার এক পাড়ার বাসিন্দা, ফলে স্কুলে একসঙ্গে যাওয়া বা পরবর্তী কালে কলেজেও এক হওয়া... সব মিলিয়ে এক কংক্রিট বন্ধুত্ব। সুমনার অসামান্য রূপে কিছু পতঙ্গ আসতই ঝাঁপ দিতে, আবার কিছু ক্ষেত্রে সুমনাও এগিয়ে যেত... আর সব ঝামেলা থেকেই বের করে আনতে হত এই কুন্তলকেই।

কলেজ ক্যাম্পাসিংয়ে পড়ুয়া ছেলে হবার সুবাদে কুন্তল ব্যাঙ্গালোরে চাকরি পেয়ে চলে যায়। সুমনা চাকরি পায় সল্টলেকের এক প্রাইভেট সেক্টরে। প্রায় মাস তিনেক হোয়াটসআপে, মেসেঞ্জারে, ফোনে বেশ ভালোই যোগাযোগ চলছিল হঠাৎ কুন্তল লক্ষ করে তিনটে জায়গা থেকেই সুমনা অফ। ফোন করলে ফোন ধরেনা...

সুমনার মাকে ও ফোন করে জিজ্ঞাসা করে, "আন্টি 'সু' এর কি হয়েছে? ফোন ধরছে না কেন?" ওর মা বলেন, "কি জানি তিন চারদিন ধরে অফিস যাচ্ছে না, কিছু

খেতেও চাইছে না... কি হয়েছে বুঝতে পারছি না..."

কুন্তল বোঝে তার প্রিয় বন্ধু কোন বড় বিপদে পড়েছে। তাই অফিসে মায়ের শরীর খুব খারাপ এই কথা জানিয়ে, ছুটি নিয়ে সে সোজা কলকাতা চলে আসে।

বাড়ি এসে মায়ের প্রশ্নের মুখে পড়ে সে বলে, "সব এসে বলছি।" তারপর সোজা পৌঁছে, সে 'সু'এর বাড়ির কলিংবেল চাপে। সুমনার মা দরজা খুলে ওকে দেখে অবাক!

— কবে এলি ? কেমন আছিস?

— আন্টি পড়ে বলছি বলে, সে সুমনার দরজায় নক করে...

— সুমনা... 'সু' দরজা খোল আমি এসেছি।

সুমনা দরজা খুলেই ওকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে। কুন্তল দরজা বন্ধ করে বলে, "এবার বল কি হয়েছে?"

সুমনা বলে, "আমি এই বাচ্চা কিছুতেই নষ্ট করব না... ও আমার... আমি একাই ওকে মানুষ করব।"

হতবাক কুন্তল বুঝতে পারে বিরাট একটা অঘটন ঘটে গেছে...

— আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বাচ্চার বাবা কে বল? আমি তাকে বুঝিয়ে রাজি করছি।

— না রে তার কোন দায় নেই আমার ভুলেই হয়েছে আর তার নাম জিজ্ঞাসা করবি না, আমি বলব না।

কুন্তল হাঁটু গেড়ে বসে বলে, “আমায় বিয়ে করবি সু? তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। বিয়ে করে তোকে নিয়ে চলে যাবো, কেউ জানবে না...”

— না রে আমি কেন তোর জীবন নষ্ট করবো! আমায় আমার মত করে বাঁচতে দে...

— 'সু' তুই বুঝছিস না। আমাদের সমাজ এখনো সিঙ্গল মাদার মেনে নেয়নি রে... আর বলছিস আমার জীবন নষ্ট হবে! হ্যাঁ সত্যিই তুই যদি আমার জীবনে না আসিস তাহলে আমি ভালো থাকতেই পারব না। তুই কি জানিস তোর সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে এই ক’দিন আমি কি অসহ্য যন্ত্রনা পেয়েছি?

— কুন্তল তুই কোনদিন ওর বাবার কথা জানতে চাইবি না তো?

— তুই কি পাগল 'সু', ওর আবার বাবা কে? আমিই তো ওর বাবা তুই জানিস না।

সুমনা বলল, “এত ভালোবাসিস আমায়! আমি অন্ধ তাই কোনদিন বুঝতে পারিনি, আর চাইনিও।” দুজনে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সুমনা মা উমাকে বলল, “মা আমরা বিয়ে করব আর পারলে আজ কালের মধ্যেই। কোন আড়ম্বরতা চাইনা।”

উমা একটু অবাক হলেও বললেন, “আরে আগে কুন্তলের মা, বাবার সাথে কথা বলি, তোর বাপি আসুক।”

সুমনা বলল, “যা করার তুমি এক্ষুনি করো।”

বন্ধন

উমা আর কুন্তলের মা কণা দুজন খুব ভালো বান্ধবী। দুজনেই এই সম্পর্ক গড়ার জন্যে খুব আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু কাউকে বলতেন না। ফোনে কণাকে জানালে সে তার বরকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা চলে এল। সুমনা আর কুন্তলের একটিই শর্ত ছিল, দু একদিনের মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে। সুমনা এখানকার অফিসে রিজাইন দিয়ে দিন সাতের মধ্যে বিয়ে করে ব্যাঙ্গালোর চলে গেল।

সুমনা বাচ্চা হবার আগে বাচ্চা নিয়ে যতটা আগ্রহী ছিল, বাচ্চা হবার পরে সে সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। ব্রেস্ট ফিড তো দূরে থাক, বাচ্চাকে আদর পর্যন্ত করত না। কেবল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফিগার আর সৌন্দর্য্য কতটা নষ্ট হল তাই দেখত। কুন্তল বাধ্য হয়ে আয়া কমলাকে রাখল। কমলার বাচ্চা ছিল না, তাই এই ছোট্ট বাচ্চাকে পেয়ে সে তার মমতা উজাড় করে দিল।

এক বছরের মাথায় সুমনা অফিস জয়েন করল। আবার শুরু হলো লেট নাইট পার্টি, প্রতিদিন দেরি করে ফেরা। বাড়ি ফিরে ঘুম, সকালে উঠে অফিস চলে যাওয়া... সংসার, বাচ্চা আর কুন্তল কি করছে এই স...ব ব্যাপারেই সে মারাত্মক ভাবে উদাসীন হয়ে পড়ল। ছেলে কৌস্তভ কমলাকে কমলা মা ডাকত। সুমনাকে মম ডাকতে শেখানো হয়েছিল। চার বছরের মাথায় খানিকটা এক্সিডেন্টের মতই সুমনা আবার মা হতে চলল।

সুমনা এবরশন করতে চাইলে, কুন্তল ওর হাতে পায়ে ধরে ওকে মানাল। সুমনা কিছুদিনের জন্যে আবার সংসারে বাধা পড়ল। ও অবাক চোখে দেখত তোজো, ওরই ছেলে ওকে কি অবাক চোখে দেখে... মাতৃত্ব জেগে উঠল... তোজোর সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতেই ছোট ছেলে জোজোর জন্ম হল। তোজো আর জোজো কে নিয়ে তার সুন্দর দিন কাটছিল। কুন্তলকে সে বলেও ছিল, “আমি আর কোন কাজ করব না, এবার আমি মন দিয়ে সংসার করব।” কুন্তল খুশী হলেও বলেছিল, “তাই হয় না কি রে পাগলী! তোর এত পড়াশুনো, এত অভিজ্ঞতা সব বাড়ি বসে নষ্ট করবি? তার থেকে বরং এবার জয়েন কর, কিন্তু মনকে শক্ত করে অফিস ফেরত বাড়ি চলে আসিস – আর পার্টি করিস না। মনে রাখবি তোর জন্যে তিনজন অপেক্ষায় আছে...

সুমনার এবারের জয়েন করাটা হয়তো কুন্তলের পক্ষে অভিশাপ হল। প্রথম পনেরো-কুড়ি দিন ঠিক সময়ে ফিরলেও আবার দেরী করে ফেরাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। কুন্তল অফিস থেকে ফিরে ছেলেদের পড়তে বসাত। স্কুল থেকে আনা দেওয়া সব কমলা করত। কৌস্তভ যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, একদিন অফিস থেকে সুমনা আর বাড়ি ফিরল না। কুন্তলের হোয়াটসআপে মেসেজ এল – ‘আমায় ক্ষমা করিস আর প্লিস খুঁজিস না।’ সুমনা সত্যি সত্যিই কর্পূরের মত উড়ে গেল।

বন্ধন

কলকাতা থেকে দুই মায়ের আকুল আকুতিতে, দুই ছেলে আর সঙ্গে ওদের কমলা-মাকে নিয়ে, কুন্তল ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতাতে ফিরে এল। প্রথমে নিজের বাবার, পরে সুমনার বাবার মৃত্যু... সব কাজই কুন্তল করল। সুমনাকে কেউই খবর দিতে পারেনি। এবার আর সুমনার কোন খোঁজ কুন্তল করেনি। বড় ছেলে যখন এম. বি. এ. পড়ছে আর ছোটটা অনার্সের ফার্স্ট ইয়ার, সেই সময় কুন্তল এক সহকর্মিনীকে দেখতে পিয়ারলেস হাসপাতালে গিয়ে, হঠাৎই অঙ্কোলজি ডিপার্টমেন্টে সুমনাকে দেখতে পায়। সুমনা চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলে, অনেক রিকোয়েস্ট করে সে ডাক্তারের কাছে জানতে পারে থার্ড স্টেজ চলছে, ওভারি ক্যানসার।

সুমনার যখন শরীর খারাপ হওয়া শুরু হয়, সেই সময় নীল – তার প্রেমিক ও সহকর্মী – তাকে ছেড়ে চলে যায়। সুমনা এতদিন মুম্বাইতে ছিল, মাঝে তোজো আর জোজোর জন্যে মন খারাপ হলেও লজ্জায় যোগাযোগ করতে পারেনি। মুম্বাইয়ের পাট চুকিয়ে কলকাতাতে আজ তিনমাস ধরে থাকলেও, বাড়িতে মায়ের কাছে যাবার সাহস যুগিয়ে উঠতে পারেনি। সে ঘুনাক্ষরেও জানত না যে কুন্তল আর তার ছেলেরা সবাই এখন কলকাতাতেই থাকে। সুমনা যে ফ্ল্যাটে থাকে তার পাশেই পিয়ারলেসের কিছু নার্স মেস করে থাকে। ওদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়াতে ওরাই সুমনাকে পিয়ারলেসএ নিয়ে আসে।

বন্ধন

সুমনা সংসারকে ভালোবাসতে শিখল... সংসার কি জানতে শিখল... সে যখন সংসার নিয়ে খুব ব্যস্ত, মন দিয়ে ভালোবেসে সংসার করছিল, ঠিক তখনি আবার তার শরীর হঠাৎ বেশ খারাপ হয়ে উঠল।

একদিন রাতের বেলা সে কুন্তলকে ডেকে বলল, "আমি চলে গেলে দুঃখ পেওনা, যা চেয়েছি সব পেয়েছি তোমার কাছে, চুটিয়ে সংসার করলাম আর কোন দুঃখ রইল না।"

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বেড টি নিয়ে এসে কুন্তল দেখে সুমনা নির্মল হাসি মুখে নিয়ে পরলোকে চলে গেছে। বালিশ ঠিক করতে গিয়ে কুন্তল একটা কাগজ পায় সেখানে। তাতে লেখা:

আমার মৃত্যুর পরে কেউ রজনীগন্ধার মালা দিওনা,
দেহের উপর ছড়িও না ওই ফুল।
খাটের ছত্রীতে বেঁধোনা রজনীগন্ধার গুচ্ছ,
দেহেতে ছড়িওনা ওগুডুর সৌরভ...

যদি সত্যিই ভালোবাসো আমায়...
দিও দুমুঠো কাঁঠালিচাপার ফুল,
আর পারলে মুঠো ভরা শিউলি ফুল।
দেহে দিও শিউলির সুবাস।
মালা যদি দিতে চাও, দিও জুঁইফুলের মালা।
হরিধ্বনি দিওনা, বড্ড ভয় লাগে শুনতে,
তাই গেও রবি ঠাকুরের কোন গান।

বন্ধন

শেষ যাত্রার সঙ্গী হলে চোখের জল ফেলো না,
আমি যে আছি বেঁচে আছি তোমাদের সবার মনে।
যেমন এখনো আছি...

আমার ছবিতে ভুলেও কখনো ফুলের মালা দিওনা,
রজনীগন্ধার মালা বা ফুলে আমি বড় মৃত্যুর গন্ধ পাই
আমার মৃত্যু দিবসে শোক কোরো না...
গান, নাচ আর আবৃত্তিতে ভরিয়ে রেখো সারাদিন
ভুলে যেওনা আমি আছি তোমাদেরই সাথে,
শুধু শরীরটাই গেছে পুড়ে, নাহলে আমার সবটা জুড়ে,
প্রবলভাবে আমার উপস্থিতি কি তোমরা টের পাওনা!

ছেলেদের ডেকে সব ব্যবস্থা করে তার 'সু'কে কুন্তল সাজাতে বসে। মাথা ভর্তি সিঁদুর দিয়ে পায়ে আলতা পড়িয়ে সুমনার বুকের উপর সে ঢলে পড়ে।

জোজো ডাক্তার ডাকলে তিনি বলেন হার্ট এট্যাক, মিনিট পনেরো আগেই মৃত্যু হয়েছে। দুটো খাট পাশাপাশি সাজানো হয়... কুন্তলের নিঃশর্ত ভালোবাসার হয়তো অবসান ঘটলো না! পরলোকে গিয়েও সে বোধহয় তার 'সু' কে এমনি নিঃশর্ত ভাবেই ভালোবাসবে... ■

লেখকদের প্রতি আবেদন

আপনারা ফটো পাঠানোর সময় খেয়াল রাখুন, আমাদের যথাযথ ফটোর সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই।

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ
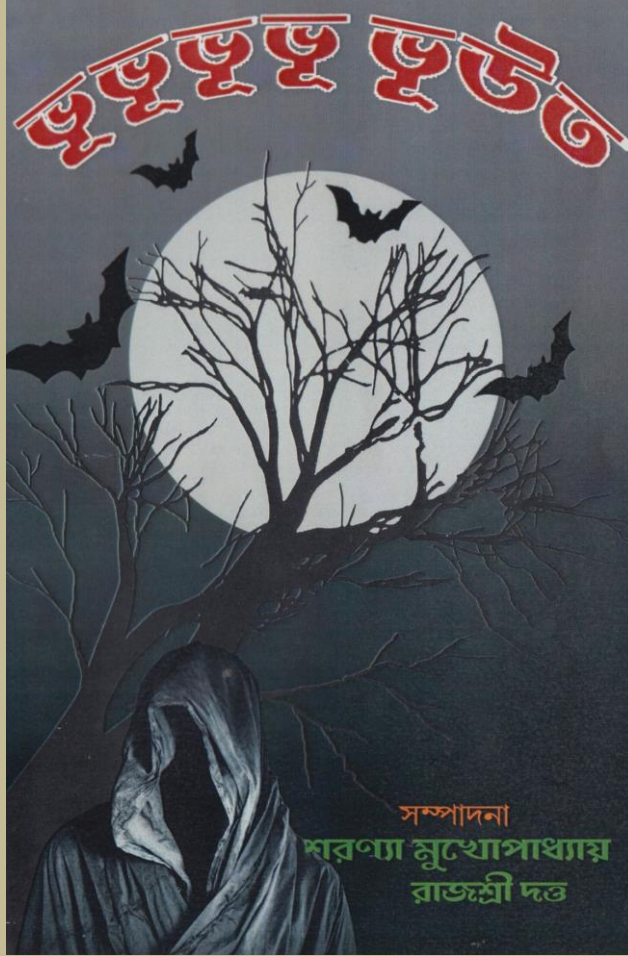
মুল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

অ্যামাজন লিঙ্কঃ

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

এখন কলেজ স্ট্রীটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ আদি নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩ ● দূরভাষঃ +৯১ ৩৩ ২২৪১ ৯১৮৩

শক্তিরূপেন সংস্থিতা

পিয়ালী চ্যাটার্জী

গোটা শহর জুড়ে পুজোর আমেজ। আজ দশমী প্রায় নব্বই শতাংশ বাঙালির মন খারাপ। আবার এক বছরের অপেক্ষা করে মায়ের দেখা পাবে। বেহালা চৌরাস্তার মৌএরও মন খারাপ। তাই সে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে নীল আকাশে ভাসা মেঘের আনাগোনা দেখছে। বারান্দা থেকে পাড়ার মণ্ডপ দেখা যায়, তবে এই বছর তার পুজোটা কেমন যেন কাটল। টেবিলের উপর রাখা ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলে, মৌ এগিয়ে গিয়ে দেখলো তার ছোটবেলার বান্ধবী তরী ফোন করেছে।

— হ্যাঁ বল।

— কিরে মৌ নীচে আসবি না? আর একটু পরেই তো ভাসান। আমি মণ্ডপে অপেক্ষা করছি তাড়াতাড়ি আয়...

— আমি যেতে পারবো না রে। তোরা থাক ওখানে। আমি রাখছি। ফোন কেটে দেয় মৌ।

মৌ ওরফে মৌবানি দত্ত, মাথায় একরাশ চুল, মুখখানা এতটাই নিষ্পাপ এবং মিষ্টি, যে হাতে একটা কলসী আর পাশে একটা পেঁচা থাকলে সবাই মৌকে দেখে লক্ষ্মী মানতে বাধ্য হবে। একাদশ শ্রেণীতে পড়ে মৌ বেহালার এক নাম করা স্কুলে। ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছাত্রী মৌ। সর্বদা

মানবিকতা

ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করে নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। ছোটবেলা থেকে মৌকে তার মা নিজেই পড়িয়েছে তবে নবম শ্রেণী থেকে মৌকে টিউশনে ভর্তি করিয়ে দেন মৌএর বাবা-মা। পড়াশোনায় ভালো হওয়ার সূত্রে মৌ শুরু থেকেই তার টিউশন স্যার অতনুর ভারী পছন্দের হয়ে ওঠে। নবম ও দশম শ্রেণীতেও যথারীতি মৌ ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করে। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবার তখন বেশ কিছুদিন বাকি – একদিন মৌকে তার টিউশন শিক্ষক অতনু ফোন করে, 'মৌ আজ বিকেলে একবার ক্লাসে এসো।'

— আজ বিকেলে? কিন্তু স্যার এখনও তো আমাদের বই দেয়নি।

— হ্যাঁ জানি বই দেয়নি তবে আগে থেকে নিজেকে তৈরি করতে হবে তো। আমার কাছে আগের বছরের কিছু নোট আছে সেগুলো তোমাকে দেব তুমি মুখস্থ করো।

— আচ্ছা স্যার আমি তাহলে বিকেলে চলে যাব।

সেদিন মৌ এর শ্রদ্ধেয় স্যার অতনু এক অন্য উদ্দেশ্য নিয়েই মৌকে ডেকেছিল যেটা মৌ জানতে পারেনি।

— একি স্যার আপনি এটা কি করছেন? আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ...

— আরে ভয় পাচ্ছো কেন মৌ। দেখো আজ বাড়িতে কেউ নেই। তোমার কাকিমা বাইরে গেছে। সামনের সপ্তাহ থেকে তোমার স্কুল শুরু হয়ে যাবে, তখন আর এমন সুযোগ আসবেনা। তুমি আমাকে পছন্দ করো সেটা আমি জানি।

মানবিকতা

— স্যার আমি আপনাকে আমার বাবার মত শ্রদ্ধা করি। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার...

হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজে মৌএর চেতনা ফিরল। দরজা খুলতেই সে দেখলো তরী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

— কিরে পুজোর সময়ও এমন পাগলী সেজে ঘুরে বেড়াবি? নতুন জামা পড়ে চটপট আয় নীচে যাব।

— আমি নীচে যাবো না রে তরী।

— কেন যাবিনা শুনি একটু?

— কাল বিকেলে তুই কাকু, কাকিমার সাথে ঘুরতে বেড়িয়েছিলিস। মাও মণ্ডপে কাজ করছিল, তাই ভাবলাম নীচে গিয়ে বসি কিছুক্ষন।

— তারপর?

মৌ এর চোখটা ঝাপসা হয়ে এল।

— ওই মেয়ে।

— হ্যাঁ আন্টি আমাকে ডাকছেন?

— হ্যাঁ তোমাকেই। ওদিকে কোথায় যাচ্ছো?

— মণ্ডপে কিছুক্ষন বসতে যাচ্ছি।

— তোমার লজ্জা নেই না? এত কিছু হলো তারপর এত সাধারণ ভাবে ঘুরছ যেন কিছুই হয়নি।

— আপনি এভাবে কেন বলছেন আমি কি করেছি?

— তুমি কিছু করনি? এক হাতে নিশ্চই কখনো তালি বাজেনা। নিশ্চই তোমার উস্কানিতেই উনি তোমার গায়ে হাত

দেওয়ার সাহস পেয়েছিলেন।

তরী জোর করে মৌ কে নীচে নিয়ে গেল। মৌ মণ্ডপের কাছে যেতেই মণ্ডপে উপস্থিত সকলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মৌএর মা মণ্ডপে সিঁদুর খেলার আয়োজন করছিল। চারিপাশের এই আচমকা নিস্তব্ধতায় সেও ফিরে দেখল মৌকে ঘিরেই এই নিস্তব্ধতা। মৌএর মা এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

— এই তরী ওকে নিয়ে এলি কেন আবার?

— কেন, ও আসবেনা কেন কাকিমা?

— না মানে...

— মানে কি? তুমিও কি এটাই বলতে চাইছো যে যেটা ঘটেছে তাতে মৌকে ঘর বন্দি হয়ে থাকতে হবে?

— তরী সবাই তো তোর আমার মত ভাবে না রে মা।

— না ভাবলে ভাবাতে হবে। আজ দুর্গা মায়ের বিসর্জনের সাথে কিছু মানুষের নীচু মানসিকতা বিসর্জন দেওয়ারও প্রয়োজন।

তরী এগিয়ে গেল মণ্ডপের ঠিক সামনে বানানো একটি স্টেজের দিকে। পুজোর কয়েকদিন ওদের পাড়ায় নাচ গানের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্টেজেরই মাইকে পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারি সিন্দুরখেলা আরম্ভ হওয়ার সময় ঘোষণা করছিল। তরী স্টেজে উঠে সেই মাইকএর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
"এখানে উপস্থিত বা অনুপস্থিত সকলকেই আমার প্রণাম। ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে শেখানো হয় বড়দের সন্মান

দিতে – আর আমরা সেই বড়রা আদৌ সেই সম্মানের যোগ্য কিনা সেটা বিচার না করেই তাদের সম্মান দিতে শুরু করি। এখানে উপস্থিত আমার বান্ধবী মৌ, যাকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনাদের এই পাড়ার শ্রেষ্ঠ মেয়ে বলে মনে হত আজ সেই মৌ আপনাদের চোখে এই পাড়ার কলঙ্ক হয়ে উঠেছে। আচ্ছা ওর দোষটা কি! দোষ এটাই যে ও সেই শিক্ষককে নিজের বাবার মত শ্রদ্ধা করত আর এতটাই বিশ্বাস করত যে ওর মাথাতেও কখনো আসেনি যে এমন একটা ঘটনা ওর সাথে ঘটতে পারে? যেখানে ওর স্যারের স্ত্রী আচমকা বাড়িতে ফিরে সমস্তটা দেখে নিজেই মৌকে উদ্ধার করে তার স্বামীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে, সেখানে আপনারা মৌকে বিচার করার কে?”

আশেপাশে উপস্থিত সকলের চোখই তখন স্টেজের দিকে। ততক্ষনে আরো অনেকেই পৌঁছে গেছে মণ্ডপের কাছে। তরী দেখে, ভীড়ের মাঝে সেই ভদ্রমহিলাটিও আছেন যে আগের দিন মৌকে কিছু কথা শুনিয়েছিলেন।

তরী আবার বলে উঠল, “কাকিমা আপনি আমার মায়ের মত। আপনাকে একটা কথা বলছি, একজন মেয়ে হয়ে অন্য মেয়ের পাশে না থাকতে পারেন অন্তত তাকে অপমানটা করবেন না। আজকাল একজন ধর্ষিতাকে এমন নজরে দেখা হয় যেন সমস্ত ঘটনাটার দায় তার একার। আচ্ছা আপনার মেয়ে তনিমাদিরও তো ব্রেকআপ হয়ে গেছে দীপ্তদার সাথে। যেহেতু ওরা আমার স্কুলেই পড়ে তাই জানি

আর কি। তা এত বছরের সম্পর্কে ওদের প্রেমটাও নিশ্চই অনেক দূর গড়িয়েছিল! কি তনিমাদি? কাকিমাকে বলোনি বুঝি যে প্রত্যেক রবিবার তুমি দীপ্তদার বাড়িতে যেতে যখন দীপ্তদার মা, বাবা কেউ বাড়িতে থাকত না?”

— আহ, তরী কি করছিস নেমে আয়।

— না, মৌ আজ না। “তা কাকিমা, একটা মেয়ে যখন নিজের ইচ্ছায় নিজের সবটুকু উজাড় করে একজনকে ভালোবাসে এবং কোনো কারণে যখন সেই সম্পর্কটা টেকে না, তখন তো আপনারা সেই মেয়েটার দিকে এমন ভাবে তাকান না? আজকাল তো অনেকে লিভ ইন করার পরেও সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলে। তাদেরকে তো আমরা খুব সহজেই মেনেনি। কারণ তারা ভালোবাসার নাম করে সেই জিনিসগুলো করে, যেটা মৌএর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর শিক্ষক ওর সাথে করতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, তার স্ত্রী ঘটনাস্থলে না পৌঁছালে, হয়তো সে সফলও হয়ে যেত। ভাবতে খুব অবাক লাগে জানেন - যেখানে ওর স্ত্রীর মত মানুষও এই পৃথিবীতে আছেন, সেখানে আপনাদের মত কিছু মানুষও আছেন যাঁরা সব কিছুর জন্য একজন মেয়েকেই দায়ী করেন। পারলে আজ মায়ের ভাসানের সাথে নিজেদের এই মানসিকতাগুলোকেও ভাসিয়ে দিন - আর যদি না পারেন তবে দয়া করে মায়ের মূর্তির সামনে হাত জোড় করে আশীর্বাদ চাইবেন না।

যে দেশে রক্ত মাংসের দেবীদের দিনের পর দিন অপমান করা হয় সেই দেশে মুর্তিরূপী ঠাকুরকে পূজা করার কোনো মানে হয়না।”

তরী স্টেজ থেকে নেমে মৌ এর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আগের দিন যে মহিলাটি মৌকে অপমান করেছিল, সে মৌএর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল। আস্তে আস্তে সিঁদুর খেলা শুরু হয়ে গেল। পাড়ার সমস্ত মহিলারা মৌএর গালে কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দিল। দশমীর শেষ বেলায় পৌঁছে মৌকে স্বয়ং দেবী দুর্গা মনে হল। ■

দুর্গাপূজার শেষে মেয়েদের সিন্দুর খেলা...

আলোকচিত্র: অরিন্দম মিত্র

সূত্র: https://www.flickr.com/photos/46852192@N03/8121519256

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

বীণাপাণি

সুভাষ মুখার্জী (নীলকন্ঠ)

॥১॥

সালটা ২০১৯, সেদিন সরস্বতী পূজা। ছুটির দিন। সকালে উঠে দাঁত মাজা হয়নি তাই সাড়ে দশটা নাগাদ ব্রাশ মুখে পাঁচিলের সামনে ঘোরাঘুরি করছি। দেখি সামনের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা ওর বাবার সাথে স্কুটিতে কোথাও বেরোচ্ছে। আধুনিক ইলাস্টিক দেওয়া শাড়ি পরে সুন্দর করে সেজেছে; বোধ হয় স্কুলে যাবে। ঠিক উল্টো দিকের বাড়ি থেকে তক্ষুণি বেরোলো শ্যামা জ্যেঠু। বুল্টিকে দেখে আদর করে নিয়ে জানতে চাইলো: "বলোতো মা আজ কি?" বুল্টি বললো আজ তো চকলেট ডে! আর একটু হলেই টুথপেস্ট সমেত এক মুখ থুতু গলায় আটকে গিয়েছিল আর কি!

মুখ ধুতে ধুতে ভাবছিলাম সত্যিই বিশ্বায়নের প্রভাব ধর্ম, পুজো, দেবতাদের উপরেও পড়েছে! সবচেয়ে কোনঠাসা তো হয়েছেন তুলনামূলক ভাবে আধুনিকা মা বীণাপাণিই! "ভ্যালেন্টাইন'স ডে" তার ছ-সাত জন চ্যালাচামুন্ডা নিয়ে মাকে এমন ঘিরে ফেলেছে যে তাঁর বীণার আওয়াজ আর কেউ কানেই নিচ্ছে না; বিশেষত তাঁর ফ্যান ফলোয়ার মানে তরুন প্রজন্ম আর কি। যা বাকি থাকছে তার বেশিরভাগই

আরাধনা

¤ বিদ্যাস্থান আর ক্লাবগুলির 'কন্ট্র্যাক্ট' দেওয়া নমো নমো করে পুজো সারা।

¤ গৃহস্থের বাজার থেকে "পুজোর জন্য" (সবচেয়ে সস্তার) ফল সবজি কেনা।

¤ পুজোর নামে কচিদের পড়ায় একটু হাঁফ ছাড়া ছু...

¤ "মোবাইল অ্যাপ"এ "হ্যাপি পুজা উইশ" (তাও যদি 'রেডিমেড' কারও পাঠানো ছবি বার্তা পেয়ে যাই তো সুবিধা হয়) আর...

¤ "সোস্যাল মিডিয়া"তে মায়ের ব্যঙ্গ চিত্র দেখে ছেলেমেয়েকে দেখানোর জন্য 'সেভ' করা।

অথচ আজ থেকে বছর কুড়ি আগেও এই অপসংস্কৃতির 'ডিস-এন্ট্রি' হয় নি। তখনো সরস্বতী পুজো বলতেই মনে আসত।

¤ দিন রাত খেটে মায়ের মন্ডপ সাজানো আর আলপনা।

¤ স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে খাটুনির পদ আর ভলান্টিয়রের সবচেয়ে কঠিন কাজটার জন্য নাম দেওয়া।

¤ পুষ্পাঞ্জলীর আগে মুখে কুটোটি না দেওয়ার শুদ্ধতা।

¤ মেয়েদের স্কুলে অবাধ ঢোকার আলাদা সুখ।

¤ খাতায় কলমে কুল মুখে তোলার পারমিশন।

¤ মূর্তির পায়ের নীচে সবচেয়ে ভয়ংকর বইগুলো গুঁজে এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

¤ (নিজের) মায়ের শাড়ি পরতে পাওয়ার আনন্দ।

¤ ফি-বছর মায়ের কাছে বিদ্যে-বুদ্ধি-সুমতি চেয়েও কেন যে পাচ্ছি না তাই রাগ করা।

¤ রোজ দেখেও না দেখা ছেলেটার "হাঁ মুখ" দেখার গর্ব।

প্রগতির ঠেলায় আজকাল এগুলো সব "অ্যালার্ম ক্লক"এর মতোই বেকার।

॥২॥

দেবী সরস্বতী শ্বেতবর্ণা, পদ্মলোচনা, শ্বেত পদ্মে আসীনা এক দিব্য নারীমূর্তি। সরস্বতী ক্ষেত্রভেদে দ্বিভূজা, চতুর্ভূজা অথবা অষ্টভূজা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সরস্বতী চতুর্ভূজা, ময়ূরবাহনা। ইনি অক্ষমালাকমণ্ডলু, বীণা ও বেদপুস্তকধারিণী। পূর্বভারতে সরস্বতী দ্বিভূজা বীণাপাণি, রাজহংসে আসীনা। তাঁর বীণার নাম কচ্ছপী। বিদ্যা এবং জ্ঞানের সূত্রে দেবীর আধিপত্য সর্বত্র; ঠিক সেই কারণে তাঁর বাহন রাজহংস – সেও জল-স্থল-অন্তরীক্ষ সর্বত্রগামী। মাঘমাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়। ভাষান্তরিত পরিভাষায় সরস্বতী শব্দকে ভেঙে সরস বতী বা জল পূর্ণা (নদী) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু মূল সংস্কৃত সরস্বতী শব্দের সঠিক সন্ধি সার এবং স্বতি। সার হল গুন আর এই স্বতি (নিজেই) এসেছে স্বতঃ থেকে। "তিনি নিজের গুণেই গুণান্বিতা"। সেই গুণ হতে পারে বিদ্যা, হতে পারে জ্ঞান, কিন্তু তার বহুলতা এতটাই যে নদীর জলধারার মতোই তা অবিরত...

বর্তমানে মা সরস্বতী প্রধাণত যে কারণে অথবা রূপে পূজিতা হন সেটি কিন্তু তাঁর পরিবর্তিত এবং আংশিক রূপ। মহাসরস্বতীর ধ্যান (শ্রীশ্রীচণ্ডী শ্লোক – ২।।

“সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ শঙ্খং
চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রণৎ-কাঞ্চীক্বণন্নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা ।।”

বাংলা অর্থঃ

সিংহারূঢ়া শশিশেখরা - মরকতমণির তুল্য প্রভাময়ী - চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র ও ধনুর্বাণ ধারিণী - ত্রিনয়ন দ্বারা শোভিতা - কেয়ূর, চন্দ্রহার, বলয় ও মৃদু-মন্দ মধুর ধ্বনিযুক্ত নূপুর পরিহিতা - দুর্গা আমাদের দুর্গতি নাশ করুন - (যিনি) রত্নে উজ্জ্বল কুণ্ডল ভূষিতা।

দেবী চন্ডীই বিভিন্ন রূপে সর্বত্র পূজিতা। "তিনি রজোগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগেদেবী" তাঁর মধ্যে রজোগুণও প্রকাশ পায়।

দুর্গোৎসব সবচেয়ে ঘটা করে পালন করা হয় এই বঙ্গদেশেই। এবং বাংলায় দেবী সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে মা দুর্গার কন্যা হিসাবেই দেখা হয়ে আসছে। যদিও আদতে মত কিছু ভিন্ন।

দুর্গাষষ্ঠীর সপ্তাহকাল আগে পিতৃপক্ষের শেষ দিন। পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার সেই ঊষালগ্নে বিগত ৯০

বছর ধরে (১৯৩১) বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হয়ে আসছে এক অমোঘ কন্ঠস্বর। শ্রদ্ধেয় বাণী কুমার রচিত, সম্পাদিত এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় পঠিত "মহিষাসুর-মর্দিনী"। এই 'মহালয়া'ও এখন বাঙালীর নস্টালজিয়া।

সরস্বতী: আমেরিকার ওয়াশিংটনএ ইন্দোনেশিয়ার এমব্যাসিতে স্থাপিত মূর্তি...

Photograph: Robert Lyle Bolton

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Saraswati_(sculpture)#/media/File:Saraswati_Sarasvati_Swan_Sculpture.jpg

সেখানে স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত করা আছে, "শ্রীশ্রীচণ্ডিকা গুণাতীতা ও গুণময়ী। সগুণ অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা অখিলবিশ্বের প্রকৃতিস্বরূপিণী। তিনি পরিণামিনী; নিত্যঃ-আদিভ্যঃ-চৈতন্য-সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় যে শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল-রূপে অভিব্যক্ত হন, সেই শক্তি বাক্ অথবা সরস্বতী; তাঁর স্থিতিকালোচিত শক্তির নাম শ্রী বা লক্ষ্মী; আবার সংহারকালে তাঁর যে শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয় তা-ই রুদ্রাণী দুর্গা। একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনাই দুর্গোৎসব।"

(তথ্যসূত্র- শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবীসূক্ত)

...ক্রমশ ■

খিদে

স্বাগতা পাঠক

ফুলের গন্ধ কেমন হয় জানেন বাবু? — বারো বছরের বাচ্চা মেয়েটা জিজ্ঞেস করল ঋদ্ধিমানকে। ঋদ্ধিমান তখন বাস স্ট্যান্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেটে সুখের টান দিচ্ছিল। অনেক বার এসে এই বাচ্চা মেয়েটা ঘুরে গেছে, একটা গোলাপ কেনার অনুরোধ করে। কিন্তু বার বার ঋদ্ধি ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভরা দুপুর বেলা ঋদ্ধি ছাড়া বাস স্ট্যান্ডে সেরকম লোকজন নেই বললেই চলে। চতুর্থ বার না শোনার পর মেয়েটি ওই কথা বলল। ঋদ্ধি এবার সিগারেটটা নামিয়ে অবাক দৃষ্টিতে বাচ্চা মেয়েটির দিকে তাকাল।

মেয়েটি একটা মলিন হাসি মুখে নিয়ে ঋদ্ধির দিকে তাকিয়ে আছে। ঋদ্ধি বলল, “কি বললি তুই?” মেয়েটি বলল, “ফুলের গন্ধ কেমন হয় সেটা জানেন?” ঋদ্ধি বলল, “জানব না কেন? নিশ্চই জানি। এই যেমন ধর তোর হাতে গোলাপ ফুল আছে, এর গন্ধটা খুব মিষ্টি, আর যেমন ধর রজনীগন্ধা, সেটার গন্ধটা তো একদম মাতাল করা, আরও মিষ্টি। আরো কত রকম ফুল আছে, সেগুলোর আরও সুন্দর গন্ধ। তুই আমাকে আরও কটা ফুলের নাম বল, আমি বলে দিচ্ছি।” মেয়েটি আবার একটা মলিন হাসি নিয়ে বলল,

বাস্তব

"গন্ধ গুলোর নাম জানেন বাবু?"

ঋদ্ধি এবার একটা হাসি দিয়ে বলল, "ধুর পাগলি মেয়ে, ফুলের গন্ধের আবার নাম হয় নাকি? যদি হতো আমি ঠিক জানতাম।"

মেয়েটি মুখে একটা কঠিন হাসি দিয়ে বলল, "আছে বাবু, নাম আছে। শুধু আপনার জানা নেই, এত শিক্ষিত হয়েও আপনি জানেন না, সেটা দেখে আমার বড্ড হাসি পাচ্ছে।" ঋদ্ধি এবার রীতি মতো রেগে গেল। এই এক রত্তি মেয়ে কিনা ওকে জ্ঞান দিচ্ছে। ঋদ্ধি এবার একটু ধমকের সুরে বলল, "খুব তো বড় বড় কথা বলছিস, আমি না হয় জানি না, তুই বল দেখি ফুলের গন্ধের নাম কি? আর যদি বলতে পারিস তবে তোর সব গোলাপ আমি কিনে নেব। আর না বলতে পারলে, তোর কানটি মুলে দেব।"

এবার মেয়েটি ছলছল চোখে ঋদ্ধির দিকে তাকিয়ে রইল। ঋদ্ধি হেসে বলল, "কি ওমনি কান্না পেয়ে গেল বুঝি? উত্তর জানা নেই, তাই তো? তাও আবার পাকা পাকা কথা।" কথাটা বলে ঋদ্ধি পকেট থেকে আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পরল, কারণ আগের সিগারেটটা এর মধ্যেই শেষ। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর বাচ্চা মেয়েটি ধরা ধরা গলায় বলল, "আপনি সত্যি জানেন না বাবু, ফুলের গন্ধের নাম কি! যদি জানতেন তবে প্রথমেই আমার সব কটা ফুল আপনি কিনে নিতেন।" ঋদ্ধি আবার

বাস্তব

মেয়েটির দিকে তাকাল। এখন ঋদ্ধির চোখে মুখে একটা, বিস্ময়ের ছাপ।

মেয়েটি আবার বলল, “বাবু আপনাকে বুঝি কেউ বলে দেয়নি, যে ফুলের গন্ধের আর একনাম ‘খিদে’...।” ঋদ্ধির হাত থেকে জলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল।

মেয়েটি হারিয়ে যাচ্ছে রাস্তা পেরিয়ে দূরের বস্তিগুলোর মধ্যে... না সে একবারও ফিরে তাকায়নি। আর একবারও অনুরোধ করেনি ফুল কেনার। ঋদ্ধি চোখের সামনে দেখতে পেল একটা অন্য পৃথিবী, হেঁটে চলে যাচ্ছে দূরে, বহু দূরে। যেখানে ভরে আছে রকমারি ফুলের গন্ধ...। যার আরেক নাম ‘খিদে’। ■

Photo: Alexandru Acea

Source: https://unsplash.com/photos/5O0nPYaXoi0

পাঠকদের জন্য

আগামী ৯ এবং ১০ই মার্চ বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ‘হোলি’ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই মহামিলনের পুণ্য দিন উপলক্ষে পাণ্ডুলিপির তরফ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি বিশেষ অভিনন্দন। সাথে সাথে আমাদের অনুরোধ খেলাটা যেন পরিবেশ এবং সমাজকে দূষিত না করেই খেলা হয়। পাণ্ডুলিপির পাঠক-সদস্যরা তাঁদের ঐ দিনের অনুষ্ঠানের ছবি (বিবরণসহ) আমাদের ই-মেল এ পাঠাতে পারেন।